অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই যাবি টুম্পা।

কোথায়?

মিডনাইট ফ্যাশন শোতে।

ওরে বাপস, এত রাতে।

তোদের ফ্ল্যাট থেকে বেশি দূর না, হেঁটেই যাওয়া যাবে। তুই আমি পালিয়ে যাবি!

মরতে চাস নাকি।

এখন তো আমাদের মরারই বয়স রে। গেলে দেখা যাবে রবি বর্মার শরীরী নারী, রবি বর্মার বর্ণময় রোমান্টিকতা, রবি বর্মার ইশারাবাহী যৌনতা। সকালের কাগজটা দেখিসনি—শাড়ির ফ্যাশান শো-শাড়ির রং, শরীরের ওপর তার ইঙ্গিতময় বিন্যাস, খসে পড়া আঁচল উদ্ভিন্ন লাবণ্যের হঠাৎ প্রকাশ–শাড়ির ভিতর থেকে ফুটে ওঠে শরীরের উদ্ভাস—সত্যসুন্দর শাড়িতে ধরা দিয়েছেন ইবকল রবি বর্মা। কাগজেই লিখেছে রে। খবরটা পড়ার পর আমার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে রে।

যাও মরো গে। সামনে আর দু-মাসও সময় নেই পরীক্ষার—তোকে এখন মিডনাইট ফ্যাশন শোতে পেয়েছে রুবি।

আচ্ছা টুম্পা তোর ইচ্ছে হয় না হালকা শাড়ির ভিতর নিজের শরীর ভাসিয়ে রাখতে? এ শাড়ি শরীর ঢেকেও পৌঁছে দেয় শরীরের বার্তা। এ শাড়ি দর্পিত করে শরীরের ইচ্ছা। এ শাড়ি আবরণ নয়—মধ্যরাতে এ-শাড়িই নারী শরীরের উদ্বোধন, আমি কাগজ থেকেই তোকে পড়ে শোনাচ্ছি রে—আহা কী সুখ, নারীর শরীরকে উত্তীর্ণ করবে উৎসবে। ভারতের টপ মডেলরা হাঁটবেন উৎসবের কোহলসিক্ত ক্ষীণ সরণিতে-রজনী উদ্দীপ্ত আঁচল কখনো উড়বে, খুলবে, খসবে। আলোর মোহময় উদ্ভাসে কখনো চমকে উঠবে অন্তর্বাসের মৃদুভাস উচ্চারণ। শুনছিস তো, কাগজে লিখেছে। কাগজ থেকে পড়ে শোনাচ্ছি। কি রে যাবি! চল না বাবা।

থাম তো রুবি। বাড়িতে টিভি দেখিস না?

কি রে কথা বলছিস না কেন। ফোনটা এত ঘ্যাস ঘ্যাস করছে কেন?

টিভিতে দেখা আর শোতে দেখা এক কথা বল—রবিবারের পাতাটা খুলে দ্যাখ, বিনোদিনী রাধা উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে। মাথা খারাপ করে দেয়। আমি একটা অ্যাড আঁকছি। পুরুষ মানুষের।

আমি কি বিনোদিনী রাধার চেয়ে দেখতে খারাপ।

কে বলেছে খারাপ। তুই আরও সুন্দর টুম্পা। ভেসে যাওয়া হালকা মসলিনে তোকে জড়িয়ে দিলে তোর নগ্ন শরীরও আশ্চর্য এক শিল্পির আঁকা ছবি হয়ে যাবে।

তুই অসম্ভব নগ্ন থাকতে ভালোবাসিস রুবি। অলকদাকে বল না এঁকে দেবে তোর ন্যুড। বিনোদিনী রাধার চেয়েও তোকে সুন্দর দেখাবে। সকাল বেলায় তোর এত খারাপ খারাপ কথা বলতে ভালো লাগে।

মারব টুম্পা। একদম বাজে কথা বলবে না। অলকদা তোমার আমার মতো বসে নেই। রেবাদির সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে।

তাতে কি হল। অলকদাকে তো তুই ভালোবাসিস। অলকদার ছবির এগজিবিশানে কী ন্যাকামিটাই না করলি।

কী মিছে কথা। তুই কী রে! অলকদা রেবাদি উটিতে বেড়াতে গেছে। অলকদাকে রেবাদি ছাড়া ভাবাই যায় না। অলকদাকে দিয়ে নুড আঁকাতে যাব কেন! ও কি আমাকে আর ভালোবাসে। ভালো না বাসলে নগ্ন হওয়া যায় বল।

রাখ তো বাজে কথা, স কালবেলায় তোর মাথায় কি ঢুকেছে বল তো রুবি। এত আজেবাজে বকছিস। আমার জেরক্সগুলি করিয়েছিস?

তুই কবে আসবি? আজই আয় না। কগজে বিনোদিনী রাধা, আমি তুই, ওফ যা জমবে না! জানিস আমার ছোটোকাকা এসেছেন। তুই তো চিনিস।

আমি কাউকে চিনি না—চেনার দরকারও নেই। টি কে-র নোটগুলো তোর কাছে আছে?

সব আছে টুম্পা। তোকে কতদিন দেখি না রে। আয় না, দু-জনে দুপুরে খেয়ে জড়াজড়ি করে ঘুমাব। আসবি। হালকা মসলিনে আমরা বিনোদিনী রাধা হয়ে যাব। কুয়াশায় ভেসে যাব।

আসলে রুবি এবং টুম্পার এখন উড়ে বেড়াবার বয়স বলা যেতে পারে, আবার উড়ে বেড়াবার বয়স নাও বলা যেতে পারে। নিজেরা নিজেদের নিয়ে অদ্ভুত মজা করতে তারা ভালোবাসে। কিছুটা উচ্চবিত্ত পরিবারের বলা যায়, তবে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধও তাদের কম না। দুজনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব এবং অদ্ভুত সব ইচ্ছের কথা অনায়াসে তারা একজন আর একজনকে বলতে পারে।

এমনকী স্বপ্ন দেখলেও এবং স্বপ্নটা যদি শরীর নিয়ে হয় এই যেমন, টুম্পা প্রায়ই স্বপ্ন দেখে সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে। একজন পুরুষ সঙ্গীও সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে। জ্যোৎস্না রাত এবং বড়ো বড়ো ঢেউ-শরীর হালকা, সায়া শাড়ি ব্লাউজ গায়ে না থাকলে শরীর তো হালকা হবেই এবং সে দেখতে পায় একটা দ্বীপ, দ্বীপে পুরুষটি তাকে পাঁজাকোলে করে হেঁটে যাচ্ছে, তারপর বালিয়াড়ি সে এবং পুরুষটির মধ্যে যদি কোনো রমণের ছবি থাকে তাও রুবিকে টুম্পা অকপটে বলে যাবে–টুম্পার একটাই কষ্ট, পুরুষটির মুখ সে চিনতে পায় না। এই আত্মপ্রকাশের মধ্যে কোনো অশিষ্টতা আছে তারা মনে করে না।

সক্কাল বেলায় এত ফাজিল কথা বলতে পারিস! তুই কী রে রুবি। হালকা মসলিন পাব কোথায়। সুতরাং এ-সব ফাজিল কথা ছেড়ে আসল কথায় আসা যাক।–আসলে মেয়েরা যেমন হয় আয় কি।

গল্পটা বর্ষাকাল দিয়ে শুরু করলেই বোধ হয় ভালো হয়। এই আকাশ ঝকঝকে তকতকে, এই মেঘ বৃষ্টি, বর্ষার আকাশের মতোই দুই বন্ধুর প্রীতি এবং সৌন্দর্য, কেমন এক অমায়িক রূপও অনুধাবন করা যায়— ওদের কোনো অলকাও নেই রেবাদিও নেই। সব বানানো, রুবি নূড়ও আঁকে না, আসলে সে ছবিই আঁকে না তবু তারা দুজনেই সুযোগ পেলে একসঙ্গে বের হয়, রবিঠাকুরের জন্মদিনে শুচিশুদ্ধ হয়ে জোড়াসাঁকো যায়, কিংবা বাংলা আকাদেমিতে কবিতা পাঠের আসরেও শ্রোতার ভূমিকা পালন করে, কোনো কবি সুপুরুষ হলে দুই বন্ধুতে ঠাট্টাতামাসা করতেও ভালোবাসে—দারুণ কবিতা, গালে রেশমের মতো দাড়ি–আজকে কবিকে আমি রেহাই দিচ্ছি না। সঙ্গে সঙ্গে রুবিও বলবে, আমিও না। যা হয় হবে।

এ মা, তুই কী রে! আমার পছন্দের জিনিস তুই চুরি করবি। আমি তাকে রেহাই দিলে তোর কি সুবিধা হয়! ঠিক আছে আমি দেখি আর কাউকে পাই কি না। একমাত্র বিনোদিনী রাধার আশ্চর্য সুন্দর চিত্রশিল্পটি ছাড়া এ-গল্পের আয় কোনো সারবত্তা নেই।

আসলে রুবির এ-সবও ফাজিল কথা—অথবা বলা যায় কথার কথা, মেট্রোতে ভালো বই থাকলে তারা একসঙ্গে দেখে, এমনকী বেড়াতে যদি যায় কেউ কারও বাড়িতে নিজের নিজের ঘরে টিভি চালিয়ে ইংরেজি অর্ধ-উলঙ্গ বই তারা দেখে, তবে কেউ দরজায় নক করলেই উঠে যায় এবং চ্যানেল পাল্টে ডিসকভারিতে এসে যায়, আসলে পড়াশোনার চাপ যথেষ্ট, তাই একটু সময় নিয়ে খেলা—আসলে গল্পটা কেন যে শুরুই করতে পারছি না-বুঝছি না, এমন দু-জন অকপট মেয়েকে যদি কোনোদিন কোনো পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রতটে দেখে ফেলা যায়—তবে তাদের কথা কীভাবে যে প্রকাশ করা যায়, এই সব

ভেবেই যখন কলমের ডগায় দুই সুন্দরী ভেসে যায় তখন তাদের খারাপ ভাবতে আমার একদমই ভালো লাগে না—গল্পটা যদি এ-ভাবে শুরু করি–

আহা কী বৃষ্টি!

বর্ষার বৃষ্টি এই আসে এই যায়। রুবি এমন সুন্দর একটি চিত্রশিল্প নিয়ে অপেক্ষা করছে সে একা বাড়িতে থাকে কী করে! বের হবার সময় টুম্পার মনেই হয়নি শেষে সারাদিনই তাকে বৃষ্টি তাড়া করবে।

বর্ষার বৃষ্টি এই আসে এই যায়।

বাড়ি থেকে বের হবার সময় টুম্পার এমনই মনে হয়েছিল। রবিবারের পাতায় বিনোদিনী রাধার হালকা অনাবৃত ভেসে যাওয়ার ছবিটা সেও দেখেছে—তবে একা, কেন যে সে রুবির অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারেনি। দু-জনে একসঙ্গে বসে দেখার মজাই আলাদা।

সে বৃষ্টি মাথায় বের হয়ে পড়েছে। বৃষ্টি কিংবা নরম রোদ অথবা বিকেলের ঘোর অন্ধকারে ছাতা মাথায় মেয়েদের এমনিতেই বড়ো রহস্যময়ী মনে হয়। যেন ঘাস ফুল পাখির মতো তারা ঝড়ের বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। বাড়ি থেকে বের হবার সময়ও টুম্পার মনে হয়েছিল বর্ষার বৃষ্টি এই আসে এই যায়। রাস্তায় বের হলেই বৃষ্টি উধাও হয়ে যাবে। কারণ মেঘ পাতলা। সূর্য মেঘের ফাঁকে দু-একবার যে উঁকি মারেনি তাও নয়। কেন যে মনে হয়েছিল, এবারে রোদ উঠবে— গানের স্কুল হয়ে রুবির বাড়ি যাবে। রুবি কী এক গোপন সৌন্দর্য তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছে, সে গেলে দু-জনে বিকেলের আকাশ দেখতে দেখতে সেই দৃশ্য এবং মগ্নতা দু জনে নিবিষ্ট হয়ে খুঁজে বেড়াবে। কাগজে বিনোদিনী

রাধার ন্যুড ছবিটা রুবি তার আলমারিতে লুকিয়ে রেখেছে। রুবির এক কথা, একা দেখতে ভালো লাগে না, তুই এলে দারুণ মজা হবে। নাভির ঠিক নীচটায় হালকা সোনালি রঙের গভীরে হিজিবিজি কি সব দাগ। স্পষ্ট নয়, আভাসে বিস্তীর্ণ মাঠের মতো ছবিটা শাড়ির হালকা আরামবোধে জড়িয়ে আছে। তুই আসবি তো!

এত আশা নিয়ে বসে আছে রুবি, বৃষ্টি বাদলা যাই হোক, আর বসে থাকা যায় না। বর্ষার সৌন্দর্যই আলাদা। গভীর এক মন্ত্রমুগ্ধ দৃশ্যকাব্যের মধ্যে যেন ঢুকে যাওয়া—সে রাস্তায় নেমে বুঝল, বৃষ্টিটা আজ ভোগাবে।

রুবির দাদা সুযোগ পেলেই আড়ালে তাকে দেখে। সেও দেখে। চোখে পড়ে গেলে দু-জনেই কেন যে চোখ নামিয়ে নেয়। আর ভাবে এই তোমার দাদাগিরি! রুবির একটুকু দেরি হলে ধমকাও, কোথায় গেছিলি! এত দেরি। কোথায় যায়, যেতে চায়, বোঝ না।

রুবিকে নিয়ে তোমার এত দুশ্চিন্তা। কী যে ভাব, তাও যদি সে কোনো তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে ঘুরত। আমরা তো পুরুষ বন্ধু খুঁজছি–সিনেমা নাটকে কবিতাপাঠে কোথায় না। দুর্গোৎসবের মণ্ডপে মণ্ডপে শুধু ওই একজনের আশায়। সে যে আমার সঙ্গ নিয়েছে। যখনই একা নির্জনে বসে থাকি, সেও এসে যায়। তাকে ছাড়া একদণ্ড সময় কাটে না, ভেবেই টুম্পা কেমন ব্যঙ্গ করে ঠোঁট উলটাল। ভিড়ের বাসে কেউ না আবার দেখে ফেলে—সে নিজের মনেই হাসছে, এত কী আশ্চর্য গোপন অভিসার তোর কাগজের পাতায় রুবি। কী আবিষ্কারের জন্য এমন পাগল হয়ে উঠেছিস রুবি।

বাড়িতে টুম্পার এমনিতেই আজকাল কেন যে মন টেকে না। কেমন একঘেয়েমি, ছুতোয় নাতায় সে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়তে চায়। আর বের হলেই কেমন এক হাঁফ ধরা জীবন থেকে যেন তার মুক্তি মেলে।

মাকে বাবাকে মিছে কথা বলতেও আটকায় না—এই যাচ্ছি, ছোটোকাকার বাসায়।

মাঝে মাঝেই সে যেমন রুবির বাড়িতে যায়—ছোটোকাকার বাড়িতেও যায়। কোথাও তার আকর্ষণ না থাকলে সে যায় না।

ছোটোকাকার বাড়িতে সে কেন যায় বোঝে। সেখানে তার একজন মামা আছেন। পদার্থবিজ্ঞানের জাঁদরেল ছাত্র। গবেষণা না কি মুণ্ডু ঘরে বসে সারাদিন দরজা বন্ধ করে চালিয়ে যাচ্ছে। দরজা খুললেই দেখতে পায় এক গাদা বই-এর মধ্যে ডুবে আছেন। তাকে দেখলেই বালকের মতো খুশি হয়ে ওঠেন তিনি। তবু সম্পর্কে মামা বলেই গম্ভীর চালে কথাবার্তা বলেন— তার পরীক্ষার প্রিপারেশান নিয়েই কথাবার্তা বেশি, সে গেলে গবেষণার চেয়ে এই দূর সম্পর্কের আত্মীয়াটির প্রতি যে ক্রমশই বেশি আগ্রহ বোধ করছেন, টের পায় টুম্পা। যতই নির্দোষ আলোচনা হোক, টুম্পা তার শাড়ি সামলাতেই ব্যস্ত থাকে।

বাসটা যাচ্ছে।

বাসের ভিড়ও বাড়ছে।

ঠোঁটে তার আবার মজার হাসি ফুটে উঠছে। একবার পরীক্ষায় বসলে হত। আজ পর্যন্ত একজন পুরুষ মানুষকেও বাজিয়ে দেখা হল না। এই শারীরিক পরীক্ষা আর কি। কেউ বাসায় নেই। সে গিয়ে যদি কোনোদিন একা আবিষ্কার করে ফেলে মামাকে, তখন তাঁর আচরণ কেমন হয় এমন কোনো পরীক্ষায় যদি মানুষটাকে ফেলে দেওয়া যায়। ইচ্ছে করলে মানুষটার ভালোমানুষের জারিজুরি নিমেষে হাওয়া করে দিতে পারে।

সে যায় সেই কারণে।

মগজে তাঁর এই সব ছবিই বেশি ভাসে। এই সব অলস ভাবনায় সে তাড়িত হয় বলেই ঘরে তার মন টেকে না। রুবির কাছে যাওয়া এই গোপন অভিসারেও মজা কম না। কাগজের একটা নড় ছবি কী আছে—বাথরুমে সে যখন নিজেকে আবিষ্কারে মত্ত থাকে তখনও শরীরে সে যে কী খুঁজে বেড়ায় বোঝে না। এত রহস্যময় শরীর নিয়ে সে যে কী করে।

তার তো বয়স বেশি না। এই কিছুদিন হল ফ্রক ছেড়েছে। ম্যাকসি পরত। বাড়িতে কোনো পুরুষ আত্মীয় এলে ম্যাকসি পরে ঘুরে বেড়ানো বাবা-মার পছন্দ না। সে শাড়ি না পরলে বাবা গুম মেরে যেতেন। তার দিকে তাকাতেনই না। তারপর কিছুদিন সালোয়ার কামিজ-তারপর শাড়ি পরতেই সে কেমন হালকা হয়ে গেল। হালকা হয়ে গেল ঠিকই, তবে চলাফেরায় অস্বস্তি। বাসে ট্রামে সালোলায়ার কামিজে খুব সুবিধে। তবে তাকে নাকি শাড়িতেই বেশি সুন্দর দেখায়।

বাসটা চলছে।

বাসটা থামছে।

বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি তেমনই পড়ছে।

কন্ডাকটার হাঁকছে, পরেশনাথের গেট।

একজন যুবক ওর পেছন দিয়ে তাকে ঠেলে বের হয়ে গেল। সে রড ধরে আছে। ঠিক যেখানে হাতে ছুঁয়ে দেখা দরকার দেখে গেছে। সে শত চেষ্টা করেও কোমর বাঁকিয়েও রক্ষা পায়নি।

সে খুবই গম্ভীর হয়ে গেল। এ কী অসভ্যতা। তখন কেন জানি সমগ্র পুরুষজাতিটাকেই ঘৃণা করতে শুরু করে। তার রাগ হয়, ক্রোধ বাড়ে–চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

ঘাড়ে উষ্ণ নিশ্বাস পড়তেই বুঝল, আবার কেউ পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কাধের উপর দিয়ে হাত বাড়াবার চেষ্টা করছে। তা ভিড়ের বাস, ঝাঁকুনিতে পড়েটড়ে গেলে হাত পা ভাঙতেই পারে।

মেয়েদের সিটের পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে—একটা সিটও খালি নেই।

তার পেছনে যে আবার একজন কোনো পুরুষ—পুরুষ কি নারী, সে শরীরের ঘ্রাণ থেকেই তা টের পায়। তা দাঁড়িয়ে থাকুক, অসভ্যতা করলেই মাথা খারাপ হয়ে যায়। রড না ধরে থাকলে টুম্পার আরও বেশি বিপদের সম্ভাবনা।

অবশ্য পেছনে দাঁড়ানো পুরুষটি তার যে চুলের ঘ্রাণ নিচ্ছে এটা সে ভালোই বোঝে।

এতে টুম্পার অবশ্য আপত্তি নেই।

তবে ভিড়ের চাপে একেবারে পেছন থেকে ঠেসে ধরলে সে খুবই বেকায়দায় পড়ে যেতে পারে। সুযোগ বুঝে কিছু করে ফেললেই তার মাথায় রক্ত উঠে যাবে। পুরুষজাতটাকেই বেহায়া নির্লজ্জ মনে হবে।

মাথা গরম করেও লাভ হয় না। হাসিঠাট্টা বিদ্রুপ তখন সারা বাসে। পুরুষ নারী তখন সব সমান—কেউ প্রতিবাদ করে না। বরং যেন মজা পায়।

এ-সব কারণে বাসে উঠলেই ধরে নিতে হয়, সুযোগ বুঝে যাত্রীদের রুচিমতো সে ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে।

তবে সে দেখেছে সবাই সমান হয় না।

সে এখনও বুঝতে পারছে না, লোকটার সত্যিই আর কোথাও রড ধরায় জায়গা আছে কি নেই। ঘুরে দাঁড়াবারও তার ক্ষমতা নেই। সে ঘামছে। তার সব অবয়বে ঘাম চ্যাটচ্যাট করছে। এবং শরীরের কোনা-খামচিতেও ঘাম জমে বিশ্রী গন্ধ উঠেছে কি না কে জানে!

কাজেই পেছনের লোকটা মধ্যবয়সী না যুবা, না প্রৌঢ় সে কিছুই বুঝতে পারছে। ঘাড় ঘোড়াবারও জায়গা নেই। বাসটা বাদুড়ঝোলা হয়ে ছুটছে।

সে দেখেছে, মধ্যবয়সীরাই বেশি ইতর হয় এবং যুবকরা যতটা পারে গা বাঁচিয়ে চলে। তবে সবাই না।

টুম্পা বুঝতে পারে বয়সটারই দোষ। শরীর যেন ক-বছরে বাতাসে ফুলেফেঁপে উঠেছে।

সে বাসায় ফিরে বাথরুমে ঢুকলে এটা বেসি টের পায়। বাথরুমে নিজেকে খোলামেলা দেখার সময় টের পায় শরীরের স্পর্শকাতর জায়গাগুলো আর বাঁধ মানতে চাইছে না। কাগজে বিনোদিনী রাধার ছবিটা কী কোনো উষ্ণতার ছবি হালকা ফিনফিনে কোনো কুয়াশায় জড়ানো। সবই অস্পষ্ট দেখা যায়, স্তন, গ্রীবা এবং নাভিমূল। নাভিমূলের দিকটাই শিল্পী আবছা রহস্যময়তায় ঢেকে দিয়েছে। ছবিটায় যে যথেষ্ট যৌনতা বিদ্যমান—এবং সে ছবিটা ইচ্ছা করলে বাড়িতেও দেখতে পারত, কারণ বাড়িতেও সেই কাগজই রাখা হয়, তবে বাবাই প্রথম কাগজটা পড়েন বলে, শেষ পর্যন্ত কাগজটা আর খুঁজেই পাওয়া যায় না—তিনি বোধ হয় চান না, টুম্পার নগ্ন ছবি দেখে মতিভ্রম হোক—কাগজগুলো যে কী করছে। পরিবারে সব বয়সের মানুষই থাকে, সবার চোখে এমন একটা উলঙ্গ ছবি খুবই দৃষ্টিকটু—অথচ সবাই চুপিচুপি ছবিটা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। রুবির বাড়িতে অবশ্য এতটা নজরদারি নেই—রুবি বড়ো হয়েছে, সে সবই বোঝে। কেবল তার বাবা-মাই মনে করে টুম্পা কিছুই বোঝে না। ভিড়ের বাসেও তার খিলখিল করে হেসে উঠতে ইচ্ছে হল।

তার বাবাটা যে কী! ন্যাকা ভাবতে পারত, শত হলেও তার বাবা, বাবাকে আর যাই ভাবা যাক ন্যাকা ভাবতে পারে না। ন্যাকা ভাবলে বাবাকে খাটো করা হয়। লুকিয়ে শেষ পর্যন্ত কাগজের সেই নির্দিষ্ট পাতাটি সে দেখেছে। বাবা পাতাটা লুকিয়ে রেখেও রেহাই পায়নি। তবে সে বিনোদিনী রাধার ছবিতে নিজেকেই আবিষ্কার করেছে। কী এমন রহস্য থেকে গেল যে রুবি ফোন করে তাকে যেতে বলেছে। দু-জনে দরজা বন্ধ করে ছবিটা দেখার

এত প্রলোভনই বা কেন রুবির। বাথরুমের বড়ো আয়নায় বলতে গেলে রোজই সে নিজেকে দেখতে পায়—কেবল শরীরে তখন থাকে না কোনো মসলিনের ওড়াউড়ি। এমন নরম হালকা মসলিন শরীরে উড়িয়ে দিয়েই ছবিটায় মধ্যে শিল্পী ঝিনুকের তলপেটের মতো উষ্ণতা সৃষ্টি করেছে।

সে তো যতটা রুচিসম্মত পোশাক পরা দরকার তাই পরে। এজন্য সে পাতলা ব্লাউজ পরে না। ব্লাউজের নীচে তার অন্তর্বাস ফুটে বের হলে লজ্জা পায়—কখনো তার নিজের বৈভব হাটেঘাটে ফিরি করার স্বভাব নয়। তবু কেন যে মনের মধ্যে কোনো প্রিয় যুবকের মুখ ভেসে উঠলেই বড়ো বেশি কাতর হয়ে পড়ে।

পেছনের লোকটার চাপ ক্রমশ ভারী হচ্ছে। রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। মুখ না ঘুরিয়েই সে বলল, একটু সরে দাঁড়ান।

সে তার পাছা সরিয়ে নেবারও চেষ্টা করছে। লোকটা কী উজবুক!

আর একটু সরে দাঁড়াতে বলায় মহিলাদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি চলছে। টুম্পা মহিলাদেরও তখন কেন জানি নষ্ট চরিত্রের মনে না করে পারে না। এই সামান্য কথায় মুখ টিপে হাসার কি যে হল—সিটে বসে যেতে পারলে পরের সুবিধে

অসুবিধার কথা কেউ আর ভাবে না। তারপর কেন যে মনে হল সরে দাঁড়ানোর কথা তার উচ্চারণ করা ঠিক হয়নি। সরে দাঁড়াবেটা কোথায়! বাসে একটা সুচ রাখার পর্যন্ত বুঝি জায়গা নেই।

রড ছেড়ে দিলে লোকটা হয়তো পড়েও যেতে পারে। আবার নাও পড়তে পারে। রড না ধরলেও এত বেশি ঠেস দেওয়া আছে যে লোকটা ঝাঁকুনিতে অনড়ও থাকতে পারে।

ভিড়ের বাসে এই এক জ্বালা।

হাতের ব্যাগটি অবশ্য তার বড়ো সম্বল। স্পর্শকাতর জায়গাগুলি দরকারে আড়াল করার জন্য ব্যাগ থাকলে খুবই সুবিধা। দরকারে হাতের খাতাটি বুকের মধ্যে চেপে রাখে। দরকারে কাঁধের ব্যাগটি পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। বাবা কাকা মামা মেসো সবার ক্ষেত্রেই আগ্রহটা যে একরকমের সে বোঝে। দোষও দিতে পারে না। মানুষ তো! এমন ভিড়ের বাসে মেয়ে পুরুষ সবাই একসঙ্গে এত গাদাগাদি সহ্য হবে কেন!

সে যতটা পারল পাছা ঘুরিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে।

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে ভিড়টা পাতলা হল। তবে এখান থেকে বাসটা টপাটপ আরও কিছু যাত্রী তুলে নিল। সিথির মোড়ে না যাওয়া পর্যন্ত বোধ হয় তার রেহাই নেই। সিঁথির মোড়ে গেলে বাসটা প্রকৃতই হালকা হয়ে যাবে সে জানে। এর আগে স্টপে বেস্টপে গাড়ি দাঁড়াবে, প্যাসেঞ্জার তুলবে। না উঠলে ড্রাইভার গড়িমসি করবে বাস চালাতে। গালিগালাজ ওদের গা সওয়া। পাত্তাই দিতে চায় না।

কী যে রাগ হয়।

সর্বত্র এক ধরনের নির্লজ্জ আচরণের সে শিকার।

কাকে দোষ দেবে।

সে পেছন ফিরে আর না তাকিয়ে পারল না। লোকটার অর্ধেক শরীর মুখ দেখা যাচ্ছে। ভালো করে দেখা তার পক্ষেও শোভন হবে না।

'একটু সরে দাঁড়ান' বলতেই বাসের সবার কাছে সে লোকটিকে লক্ষ্যবস্তু করে তুলেছে। বেশি কিছু বলে লোকটিকে আর অপ্রস্তুতের মুখে ফেলতে চায় না। হয়তো লোকটির বিন্দুমাত্র সরে দাঁড়াবার জায়গা ছিল না।

প্যাঁচপ্যাচে গরমে সে অনবরত ঘামছে আর মুখ ঘাড় গলা রুমালে মুছে নিচ্ছে।

আর তখনই সামনের স্টপে মোটকা মতো মহিলাটি প্রায় দু-জনের মতো জায়গা ফাঁকা করে নেমে গেল। টুম্পা টুক করে বসে পড়ল।

সে চোখ তুলে তাকাল।

আরে রুবির ছোটোকাকা যে। ছিঃ ছিঃ কী না মনে করল।

সে তো রুবির ছোটোকাকাকে চেনে।

রুবিদের বাড়ি রথতলায়। রুবির জন্মদিনে সে তার ছোটোকাকাকে দেখেছে। লাজুক প্রকৃতির মানুষ। এমনকী রুবি তাকে তার ছোটোকাকার ঘরে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলেও তিনি তাকে চোখ তুলে দেখেননি।

রুবিই বলেছিল কাকা তার মিলিটারির ডাক্তার। শর্ট কমিশনে ছিলেন, পারমানেন্ট কমিশনে যেতে রাজি হননি। চাকরিটা বোধ হয় তার পছন্দ হয়নি। এখন ভাবছেন, এখানেই চেম্বার খুলবেন। কত বয়স মানুষটার!

আর এক বার দেখবে নাকি চোখ তুলে।

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ। কমও হতে পারে। আবার বেশিও হতে পারে।

সে তো বাইশ।

ইস কী যে সব ভাবছে। তার নিজের মধ্যেই এক অদ্ভুত দ্বৈত সত্তা পুরুষের জন্য ক্রিয়া করতে থাকে। বয়সের ফারাক নিয়ে মাথা ঘামাতে কেমন সংকোচ বোধ করছে। একদণ্ড আগে কত কুৎসিত চিন্তা মানুষটি সম্পর্কে। একদণ্ড পরে রুবির কাকাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে। দশাসই চেহারা, দীর্ঘকায়, পুরুষের মতো পুরুষ।

তার দিকে তিনি সেদিন ফিরেও তাকাননি।

এই আমার বন্ধু টুম্পা।

অ। হাত জোড় করে নমস্কার। সে দেখতে কেমন একবার যদি চোখ তুলে তাকাতেন। এত অহংকার।

অপমানের শোধ তুললে কেমন হয়!

সহসাই সে কেন যে বলে ফেলল— আপনি বসুন, জায়গা হয়ে যাবে।

না, ঠিক আছে।

টুম্পা সরে বসে জায়গা করে দিতে চাইছে—কিন্তু তিনি রাজি না।

এসে তো গেছি।

তার বলার ইচ্ছে হল, এসে গেলে কি বসা যায় না। একটুক্ষণ, এই একটুক্ষণেই বড়ো মাধুর্য সৃষ্টি হয় জীবনে, সেটা কি বোঝেন!

মহিলাদের সিটে বসলে কখন না আবার উঠে পড়তে হয় এমন লজ্জাকর পরিস্থিতির কথা ভেবেই হয়তো তিনি তার অনুরোধ রক্ষা করলেন না। সামনের দুটো স্টপের পর তারা দুজনেই নেমে গেল।

টুম্পা তো জানে রুবির কাকা কোথায় যাবেন। কিন্তু তিনি কি জানেন, সে কোথায় যাচ্ছে! শেষে না পেরে বলল, আমি রুবির বন্ধু। আপনি রুবির ছোটেকাকা না!

তাই নাকি, তাই নাকি!

যেন সে একটা বাচ্চা, বড় আদুরে গলায় তাই নাকি তাই নাকি বলতে বলতে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

রুবি দৌড়ে এসে কাকার ঘরে উঁকি দিয়ে বলল টুম্পাকে কোথায় পেলে?

ওর নাম বুঝি টুম্পা, কোনো আগ্রহ নেই। বাইশ বছরে যুবতীর পক্ষে এটা যে কত বড়ো অসম্মানের অথবা বড়ো অপমানও বলা যায়, টুম্পা রুবির ঘরে বসে সব শুনে ক্ষোভে জ্বলছিল।

রুবি ঘরে ঢুকে বলল, কি রে টুম্পা, তোর মুখ গোমড়া কেন রে!

কী করে বুঝবে ভিতরে কত জ্বালা তৈরি হয়—এত অবহেলা একটু আলাপ পর্যন্ত না। এত বড়ো মহাপুরুষ তুমি, আসলে সে যে এই মানুষটার খোঁজেই এসেছে—আমার ছোটোকাকা বাড়ি এসেছে শুনেই সে কেন যে ক-দিন থেকে অস্থির ছিল। কোনোও অজুহাতে একবার ঘুরে এলে হয়, বিনোদিনী রাধার ছবি দেখা একটা অজুহাত ছাড়া কিছুই নয়, দু-জনে একসঙ্গে বসে দেখার মজা, কত আর মজা, এ তো বারবার নিজের শরীরকেই দেখা— বিনোদিনী রাধার প্রায় উলঙ্গ শরীর যতই মসলিনে জড়িয়ে জ্যোৎস্নায় ভেসে থাক— সে তো বোঝে এ-শরীর তারই—সব নারীর।

রুবি দু-কাপ চা নিয়ে বসল তার পাশে—

সেন্টার টেবিলে চা রেখে বলল, এক্ষুনি দেখবি না পরে।

টুম্পা কিছু বলছে না।

কি রে, হলটা কি!

সে বলল, আমি উঠব রুবি।

তোর শরীর খারাপ!

জানি না।

জানিস, ছোটোকাকা না লুকিয়ে ছবিটা সকালে বারবারই উলটেপালটে দেখেছে। কারও চোখে না পড়ুক, আমি ঠিক টের পেয়েছি।

টুম্পা আরও কেন যে অস্থির হয়ে উঠল।

এই চল।

কোথায়!

আমাকে একটা ট্যাক্সি ধরে দিবি।

এই তো এলি! চল ছোটোকাকার ঘরে। কথা বলবি।

তোর ছোটোকাকা কি মহাপুরুষ!

মহাপুরুষ হতে যাবেন কেন। তোর কথা খুব বলে। এবারে ফিরেই বলেছে, তোর বন্ধুর খবর কি রে, ও আর আসে না।

কেমন এক আশ্চর্য স্নিগ্ধতায় তার শরীর মন ভিজে গেল। নিজের ভিতরেই সে গলে যাচ্ছে—বিনোদিনী রাধার ছবিতে কি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। ভিতরে সে সত্যি উষ্ণ হয়ে উঠছে।

তবু কি যে হয়, বের হবার মুখে টুম্পা দরজায় উঁকি দিয়ে বলল, যাচ্ছি। আমি বুঝে কিছু বলিনি।

তোমার দোষ হবে কেন। ভিড়ের বাসে সত্যি তো তোমার কষ্ট হচ্ছিল। আমারও উপায় ছিল না। একবার ভাবলাম নেমে পড়ি, ভিড় ঠেলে নামাও যে কঠিন।

টুম্পা বলল, যাই।

তিনি তাকে এই প্রথম দু-চোখ মেলে দেখলেন। আশ্চর্য রোমান্টিক চোখ। পৃথিবীর তাবৎ সুধারসে যেন তিনি উপচে পড়ছেন। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন। তিনি যে তার অন্তর্বাস ভেদ করে সব দেখে ফেলছেন বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি।

বাড়ি ফিরে টুম্পা আরও অস্থির হয়ে পড়ল—কেন যে মনে হচ্ছে, তিনি এখনও বোধ হয় লুকিয়ে সেই নগ্ন ছবিতে ডুবে আছেন। শিল্পীর আঁকা সেই মুগ্ধতায় ডুবে যাওয়া ছাড়া তাঁর বোধহয় উপায়ও নেই। মানুষ তো শরীর নিয়েই বাঁচে। মানুষটার কথা যত ভাবছে তত উতলা হয়ে উঠছে।

সে ভালো করে খেতে পারল না পর্যন্ত।

বাবা ফিরে এসে দেখলেন সে শুয়ে পড়েছে। সে শুনতে পাচ্ছে। টুম্পার কি শরীর খারাপ? কি জানি! মা-র কথাবার্তায় অবজ্ঞার সুর।

দরজা বন্ধ করে না শুলে বাবা হয়তো ঘরে ঢুকে কপালে হাত দিতেন। অসময়ে শুয়ে পড়লে বাবা যে ঘাবড়ে যান কেন এত, সে বোঝে না।

তার বড়োই অসময়।

আবার সুসময়ও। কেন যে সব ভেসে যাচ্ছে।

কিন্তু কেউ তো জানে না, সে একেবারে অবিন্যস্ত হয়ে শুয়ে আছে। সে ক্রমশ অতলে ডুবে যাচ্ছিল। হাতড়ে হাতড়ে নিজেকে খুঁজছে, নিজের মধ্যে।